প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশের বিজ্ঞান ও তার রূপলেখা

ঔপনিবেশিকতা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারিত। আমরা সাধারণত, ঔপনিবেশিক রাজনীতি, ঔপনিবেশিক সমাজ, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের উল্লেখ করে থাকি, কিন্তু এই ঔপনিবেশিকতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আওতার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কি আনা যায়? 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' নিয়ে কি কোনও রকম আলোচনা করতে পারা যায়? বিজ্ঞানের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা বা ব্যাপ্তি প্রশ্নাতীত। বিশ্ব ইতিহাসের উপর, বিজ্ঞান বা শিল্প বিপ্লবের প্রভাবও প্রশ্নাতীত, কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা যায়, এই ইতিহাসে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। কারো মতে ঔপনিবেশিকতা যুক্তিপূর্ণ, আবার কেউ বলেন যুগোপযোগী আদর্শ।

ঔপনিবেশিক বিস্তার কোনও অসংলগ্ন ঘটনা নয়। আদর্শ বা ভাবধারার স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিকাশের অবদান অনস্বীকার্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই স্থানান্তর ছিল আদান-প্রদান ভিত্তিক কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কর্তৃত্ব বা প্রাধান্যের প্রয়োগ। "কর্তৃত্ব, প্রাধান্য ও শাসনই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের সারমর্ম"[১] —সাম্রাজ্যবাদের তুঙ্গ অবস্থার এই ছিল উপলব্ধি। একজনের প্রাধান্য মানে অপরজনের পরাধীনতা—এই অযুগ্ম সমীকরণই ছিল ঔপনিবেশিকতার ভিত্তি। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় এইভাবে করা যেতে

Scanned by CamScanner

পারে—"পরাধীন বিজ্ঞান যেখানে ফলদায়ক, ফলিত বিজ্ঞানের গুরুত্ব, অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক মৌল বিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশি।"[১] যদিও এই সংজ্ঞা আমার মতে আদৌ যথোপযুক্ত নয়। মৌল বিজ্ঞান, ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যগুলি প্রথম প্রকাশ পায় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে, যদিও এই পার্থক্যগুলি এখনও সুস্পষ্ট নয়। এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রে 'ফল ভিত্তিকের' পরিবর্তে 'ক্ষমতা ভিত্তিক' এবং 'অনুসন্ধান'-এর পরিবর্তে 'জ্ঞান' উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা 'ক্ষমতা' এবং 'জ্ঞান' একই মুদ্রার দুটি দিক। এই মতে ক্ষমতা বা জ্ঞান, ক্ষমতা বা সংস্কৃতির আর একটি দিক। এই দুই-এর সংমিশ্রণেই কর্তৃত্ব বা প্রাধান্যের সৃষ্টি। এই কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই নির্বিরোধ নয়, এমনকী একচ্ছত্র ক্ষমতার মধ্যেই ক্ষমতাচ্যুতির বীজ নিহিত থাকে। ঔপনিবেশিকতার মধ্যে রয়েছে একত্ব ও দ্বন্দ্ব, লক্ষ ও বৈপরীত্য, ক্ষমতা ও দুর্বলতা। একগুচ্ছ গঠনপ্রণালী ও একগুচ্ছ আলোচনাভিত্তিক তত্ত্ব, এগুলিকে একত্রীভূত করেই প্রাধান্য বা কর্তৃত্বের বিভিন্নরূপ প্রকাশ হয়েছে। এই প্রাধান্য বা কর্তৃত্বই ঔপনিবেশিক, এবং উপনিবেশের অধিবাসীদের অস্তিত্ব, তাদের দেহ ও মন সমস্ত কিছুই প্রভাবিত করেছিল। যেহেতু বিজ্ঞান, সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সুতরাং এক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম থাকার কথা নয়, আর এই থেকেই আমরা পাই 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের' মতো বিষয়ের চেহারা।

বহু বছর ধরে এই বিষয়ের ওপর যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে পূর্বোক্ত আলোচনার একটি রূপরেখা টানা যায়। এই বিষয়ের ওপর প্রথম বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা পাই সম্ভবত ১৯৪২ সালে, চার্লস ফোরম্যানের গবেষণামূলক নিবন্ধ 'সায়েন্স ফর এমপ্যায়ার'-এ, যেখানে ১৮৯৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[২] ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়, যেগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নানা প্রাণবন্ত বিতর্ক ও কিছু নতুন গবেষণাও। ফলস্বরূপ ১৯৮০ সালে প্রচুর প্রবন্ধ ও রচনা আমরা পাই। ১৯৫০-এর শেষ ভাগে ডুপ্রি এবং বার্নাড কোন লেখেন, যে আমেরিকাই ইউরোপের বিজ্ঞানের উৎস।[৩] পরবর্তীকালে, ডোনাল্ড ফ্লেমিং মার্কিন ধ্যানধারণাগুলি অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন এবং তাঁদের মিল ও অমিলগুলিরও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। একটি সাধারণ উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল, যে 'প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিরীক্ষাই' উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান সম্পর্কিত উদ্যোগগুলির পথপ্রদর্শক। তাঁর মতে ব্যবহারিক প্রয়োজন বা সম্ভাবনার অনুমান, এই দুই-এর যুগপৎ প্রেরণাই, এই নিরীক্ষাগুলিকে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং ঔপনিবেশিক উদ্যোগেরও সৃষ্টি করে।[৪] বস্তুতপক্ষে উপনিবেশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনের সাথে সাথে, তার আর্থিক লাভের সম্ভাবনার পরিচয় দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। ফ্লেমিং দু'টি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন—(১) ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ (যেমন লিনিয়াস বা ব্যাঙ্কস), যাঁদের ব্যবহার ছিল অনেকটা অনুপস্থিত জমিদারদের

মতো, যাঁরা দুনিয়ার সব প্রান্ত থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য দাবি করতেন এবং পেতেও যেতেন। (২) ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানী যাঁরা মোটামুটিভাবে অধীনস্থের ভূমিকা পালন করতে পছন্দ করতেন, যেহেতু এই ভূমিকায় তাঁদের তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের ঝুঁকি নিতে হত না। ফলস্বরূপ জীবতত্ত্বের বৈজ্ঞানিককে 'অর্থকরী মানুষেরই'[৫] ভিন্নরূপ হিসাবে প্রতিভাত করা হত, এবং তাঁরা আবিষ্কারক বা ঔপনিবেশিকের থেকে বিশেষ পৃথক বলে মনে গণ্য হতেন না।

ছক (মডেল)

এই নির্ভরতার ভূমিকাকেই জর্জ বাসাল্লা কিছুটা পরিবর্তিতভাবে প্রচারকের আদর্শ হিসাবে দেখিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বিবর্তনের এক তিনপর্বের পরিকাঠামো পেশ করেন, যার মাধ্যমে ইউরোপের বাইরের দেশগুলিতে পশ্চিমি বিজ্ঞানের প্রসারের ব্যাখ্যা তিনি দেন।[৬] প্রথম পর্বে অবৈজ্ঞানিক সমাজকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তির এক উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছে, দ্বিতীয় পর্বকে বলা হয়েছে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান, এবং তৃতীয় পর্বে এক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অর্জনের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সংস্থাপন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হয়েছে। প্রথম পর্বটি মূলত অনুসন্ধানী। 'অবৈজ্ঞানিক' শব্দটি সাধারণভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুপস্থিতি বোঝালেও, জর্জ বাসাল্লা প্রাচীন সভ্যতার নিজস্ব জ্ঞান বা বিদ্যাকে কোনওভাবেই খাটো করেননি। একইভাবে 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' শব্দটিরও এমন ব্যবহার করেননি যার থেকে এমন এক বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বোঝায়, যা ইউরোপের বাইরের বিজ্ঞানকে দমন বা অধীনস্থ করে রেখেছিল।[৭] তাছাড়া এই কার্যকালের ক্ষেত্রগুলিও সবসময় প্রচলিত ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির অন্তর্গত ছিল না, (আমেরিকা ও জাপান)। বস্তুত নির্ধারক উপাদানটি হল পশ্চিম ইউরোপের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতা। আসল সমস্যার উদ্ভব হয় দ্বিতীয় পর্ব থেকে তৃতীয় পর্বে উত্তরণের সময়। বাসাল্লা তৃতীয় পর্ব সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য অনেকগুলি শর্ত আরোপ করেছেন। শর্তগুলি হল বিজ্ঞানের প্রতি দর্শনশাস্ত্রগত বা ধর্মীয় বাধাদানের (যেমন কনফুসিয়াসবাদ) বিলোপসাধন, সামাজিক অনুমোদন এবং সরকারি সমর্থন আদায়, সুসংগঠিত বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রযুক্তিগত ভিত্তি স্থাপন করা, স্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা, এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে অধিকতর পেশাদারিত্ব অর্জন করা ইত্যাদি। বাসাল্লা সমস্ত ব্যাপারটি অতীব দ্রুততার সঙ্গে সার্বজনীন স্তরে নিয়ে গেছেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে এবং বিভিন্ন সময়ে ঘটিত একটি অত্যন্ত জটিল ব্যাপারকে, তিনি কেবল একটি একমাত্রিক পরিকল্পনার মধ্যে সংক্ষিপ্ত করেছেন। স্থান, কাল, পাত্র সব বিষয়েই তিনি অতিরিক্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত, সেখানেও তিনি মিল বা সংগতি বা সমশ্রেণীভুক্তি ধরে নিয়েছেন, সে পশ্চিমি বিজ্ঞান বিশ্বাসই হোক বা শহর-উপনিবেশ বা আন্তঃঔপনিবেশিক সম্পর্কের

Scanned by CamScanner

ব্যাপারই হোক।[১] ব্যাপ্তিবাদী ছকেও এর মধ্যে অক্রিয়তার প্রবণতাই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ প্রথম পর্বটি সম্পূর্ণ একমুখী। এখানে জ্ঞানের প্রবাহ বয়েছে উপনিবেশ থেকে ইউরোপের দিকে। সেক্ষেত্রে প্রচার বা পরিব্যাপ্তি কিভাবে সম্ভব হল? দ্বিতীয় পর্বে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীকে এক বহিরাগত বৈজ্ঞানিক-সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল দেখানো হয়েছে, তবুও 'তিনি ঐ সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অংশীদার নন। এটি যথাযথ নয়। শহরকেন্দ্রিক পণ্ডিতদের (যেমন জোসেফ ব্যাঙ্কস্, জন লিন্ডলে, ডব্লিউ. জে. হুকার) ব্যক্তিগত রচনাসামগ্রী থেকে দেখা যায় যে তাঁরা তাঁদের প্রান্তিক সমকর্মীদের বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা বা সম্ভাবনাকে কখনই তুচ্ছ করেননি[১০]। ইনকস্টার দেখিয়েছেন কিভাবে অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীরা সেই 'অদৃশ্য শিক্ষায়তনে'[১১] স্থান করে নিয়েছিলেন। তবে তার মধ্যে এটাও ঘটনা যে দ্বিতীয় পর্বে জন্ম নেওয়া চেতনাগুলি ভ্রূণ পর্যায় থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করতে প্রয়োজন ছিল তৃতীয় পর্বের কিছু শর্ত পালন; ইউরোপকেন্দ্রিক ছাঁচে এই গভীর সম্পর্ক, পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তির পরও, কখনও ছিন্ন হয় না। অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি যথাযথ বা প্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু ভারত বা মিশরের ক্ষেত্রে কি তা হয়েছে? শ্বেতাঙ্গ দেশ দুটি ইউরোপের সঙ্গে যত সহজে একাত্ম হতে পেরেছে, ভারত বা মিশরের ক্ষেত্রে তা কখনই পারেনি, বরঞ্চ এই দেশগুলির ঔপনিবেশিক সম্পর্কের মধ্যে, একটি সাংস্কৃতিক ব্যবধান সবসময়ই থেকে গেছে, সময়ের সঙ্গে যা আরও বেড়েছে। এই দেশ দুটিতে যখন ঔপনিবেশিকরা আসে তখনই তাদের এক সুদীর্ঘ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ঐতিহ্য এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ছিল। বস্তুত 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' যখন জোরদারভাবে চালু, তখন উভয় পক্ষেরই পেশাদারি মনোভাব সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের উপর একটা সামাজিক ও মানসিক চাপ ছিল। এই ব্যাপারে বাসাল্লার কোনও বক্তব্য নেই, কিন্তু ফ্লেমিংয়ের আছে।[১২] ফ্লেমিং 'অস্ট্রেলীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং তাঁদের পারিপার্শ্বিক সমাজের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের'[১৩] কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও উভয়পক্ষই একই জাতিগত ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারক। আবার পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের দুই সভ্যতা, (যেমন দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে) যখন মুখোমুখি হয়েছে তখন তাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব আবার পৃথকরূপে দেখা গিয়েছে। যাই হোক, বাসাল্লা কিন্তু এক তীব্র তর্কবিতর্কের অবতারণা করে দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে বেশ কিছু বিপরীত ছক উঠে এসেছিল, যদিও এর ভিতর কিছু মেকি ছকও ছিল।

এক দশক পরে মাইকেল ওরবয়েস লিখলেন 'সায়েন্স অ্যান্ড ব্রিটিশ কলোনিয়াল ইম্পেরিয়ালিজম'[১৪] তিনি মোটামুটিভাবে নীতির বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় বাদ দিলে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান মোটামুটিভাবে ফলিত বিজ্ঞান। সংজ্ঞা হিসাবে তিনি বলেছেন 'যে বিজ্ঞান বাস্তব সুযোগসুবিধা আদায় ও ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সন্নিবদ্ধ জ্ঞানের সৃষ্টি করে।'[১৫] তাঁর মতে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

অবশ্য তিনি উপেক্ষা করেননি যে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ভোগ করতেন যার জোরে তারা কখনও কখনও কোনও রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রতিবাদ করতে পেরেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভূমি সংস্কার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা সুদূর প্রসারী পরিবেশ নীতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার ফলে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে এই ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরাই প্রথম খাদ্য উৎপাদনের স্থানীয় প্রথা উপেক্ষা করার নীতির বিরোধিতা করেন।[১৬] ওরবয়েসই প্রথম কয়েকটি ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের উপর ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীদের প্রভাবের চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা ছিল মোটামুটি শহরকেন্দ্রিক (মেট্রোপলিটান)। তিনি বেশির ভাগ সময় ইংলন্ডে অনুষ্ঠিত ঘটনাগুলির উপর জোর দিয়েছেন, কিংবা উপনিবেশের ঘটনাবলি ইংলন্ডের শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের উন্নতির চেষ্টা বা আঞ্চলিক (পরবর্তীকালে জাতীয়) বিজ্ঞান গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনও আলোকপাত তিনি করেননি। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন রয় ম্যাকলিয়য়ড। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারে আরও নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করেছেন ইনকস্টার।

পুনরালোচিত নগর বা মেট্রোপলিস

ম্যাকলিয়ডের মতে মুখ্য বিচার্য বিষয় কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের অন্তর্গত বিজ্ঞান নয়, বরং 'সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস হিসাবে বিজ্ঞান'।[১৭] বক্তব্যটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র 'সাম্রাজ্যবাদ'-কে কেন্দ্র করেই অবিরাম তর্কবিতর্ক চালু রয়েছে, আর এর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস, যা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কাজ করে গেছে এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছে। ম্যাকলিয়ড বিষয়টির অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি নতুন শ্রেণীবিভাগের লোভ সম্বরণ করতে পারেননি। তিনি তথাকথিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিজ্ঞানের (১৭৮০-১৯৩৯) বিবর্তনের পাঁচটি শ্রেণী লক্ষ করেছেন।[১৮] এগুলি হল—

(১) শহরকেন্দ্রিক (মেট্রোপলিটান) বিজ্ঞান—এর বিশেষত্ব হচ্ছে অনুসন্ধানী, ব্যাদ্ধসীয় এবং সুসংলগ্ন প্রয়োগ। এর ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের অগ্রগতি হয়েছে, আবিষ্কার হয়েছে কাঁচামাল ও নতুন বাজার।

(২) ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান—এর বিশেষত্ব হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক প্রভুত্ব, আদিম সমাজব্যবস্থা, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক কর্মসাধন—যেখানে প্রাথমিক উৎপাদন উপযোগী প্রযুক্তি এবং স্থানীয় বাজার—এইগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৩) চুক্তিবদ্ধ (ফেডারেটিভ) বিজ্ঞান—এর বিশেষত্ব হচ্ছে সমবায়, সাম্রাজ্যিক গবেষণা, উচ্চশিক্ষা এবং পেশাদারি উপযুক্ততা। এর ফলে এসেছে উন্নততর প্রযুক্তি এবং বিশ্ববাজারে অধিকতর অংশগ্রহণ।

Scanned by CamScanner

(৪) কার্যকরী সাম্রাজ্যিক বিজ্ঞান—এর বিশেষত্ব হচ্ছে রীতিবদ্ধ বিজ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ চর্চা ও অভিজ্ঞ ও কুশলী ব্যক্তিদের প্রাধান্য এবং ভূমি, সম্পদ ও শিল্পের বিচক্ষণ পরিচালনা।

(৫) সাম্রাজ্য বা তার মৈত্রীভুক্ত রাষ্ট্রে বিজ্ঞান—এর বিশেষত্ব হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক অছি ব্যবস্থা, সমন্বিত মৌলিক গবেষণা এবং ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীগুলির বন্ধনসূত্র হল শহরকেন্দ্রিক কর্তৃত্বযুক্ত বা অছি ব্যবস্থা যুক্ত সাম্রাজ্যিক বিজ্ঞান। এই সাম্রাজ্যিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে ম্যাকলিয়ড কখনও বলেছেন একগুচ্ছ গঠনপ্রণালী, আবার কখনও বলেছেন 'অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু অস্পষ্ট এক কল্পনা বা উদ্দেশ্য বা সাধনার প্রকাশ'।[১৯] সবকিছু মিলিয়ে বিজ্ঞানকে সাম্রাজ্যিক ইতিহাস হিসাবেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে সম্ভবত কিছু অত্যুক্তি থেকে যায়। বিজ্ঞান কি কখনও সম্পূর্ণ একটি সাম্রাজ্যকে ভিত্তি করে সংগঠিত হয়েছে বা চর্চিত হয়েছে? ওরবয়েস বরং যুক্তিসহকারে বলেছেন যে সাম্রাজ্যিক বিজ্ঞান বলে কিছু ছিল না। বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞান সেই ব্যাপক রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিভাজনকেই অনুসরণ করে গেছে যে বিভাজনে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশ বা স্বায়ত্বশাসিত উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে পৃথক নীতি ও কর্মতৎপরতা চালু করেছিল।[২০] লক্ষ বা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু তার গতিপ্রকৃতি বা তীক্ষ্ণতা স্থান কালের হিসাবে পরিবর্তিত হত। অনুরূপভাবে গঠন প্রণালীরও পরিবর্তন হত।

এছাড়াও ম্যাকলিয়ড যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলির অনুরূপ উত্তরই পাবেন, যদি বিজ্ঞানকে সাম্রাজ্যিক ইতিহাস হিসাবে গণ্য না করে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ধরা হয়। বিজ্ঞান এবং সাম্রাজ্যই (ম্যাকলিয়ড নিজেই যাকে রাজনৈতিক অভিব্যক্তির সাংস্কৃতিক পরিভাষা বলে ব্যবহার করেছেন) যথাযথ বর্ণন বলে প্রতিভাত হয়।[২১] এই বর্ণনের দ্বারা উভয়কেই তুলনামূলক স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আবার উভয়ের মধ্যে সম্পর্কেরও প্রকাশ পায়।

পূর্বোক্ত পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে বিষয়বস্তু ও সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শহরকেন্দ্রিক পর্বের শেষ কোথায় এবং কেনই বা এই পর্বটি কেবল অন্বেষী, ব্যাঙ্কসীয় যুগের মধ্যেই সীমিত থাকবে, যেখানে শহরকেন্দ্রিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'বিজ্ঞানের একটি পন্থা হিসাবে।'[২২] যুক্তি হিসাবে বলা হয় শহর গতিহীন বা নিশ্চল নয়, কিছু শর্ত পূরণ হলে, তা প্রান্তিক সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ে বা প্রসঙ্গে, প্রথম তিনটি শ্রেণীর মধ্যেই শহরের কর্তৃত্বময় উপস্থিতি দেখা যায়। মেধাগত কর্তৃত্ব, যা ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সেটি শেষ শ্রেণীর তথাকথিত অছি ব্যবস্থার মধ্যে পরিস্ফুট। উপনিবেশগুলি যখন অধিকতর স্বায়ত্বশাসন পেতে শুরু করেছে তখনই কেবল বিজ্ঞানের

'ব্যবহারিক প্রয়োগ'-এর গুরুত্ব কমেছে। ম্যাকলিয়ড অবশ্য কখনই ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানকে 'অল্প বুদ্ধির নিম্নতর বিজ্ঞান' বলে বর্ণনা করেননি, বরং তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান উপনিবেশকারী দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে পেরেছিল।[২৫] কিন্তু এক্ষেত্রেও উপনিবেশকারী দেশগুলি নিজের প্রয়োজনেই ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ প্রান্তস্থল প্রান্তিক ব্যবহারই পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় চুক্তিবদ্ধ পর্বেও 'বিজ্ঞানের সৈন্য' আমরা দেখতে পাই, যেমন রোনাল্ড রস, যিনি মশার উপর ব্যক্তিগত গবেষণা চালিয়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে সেক্ষেত্রে কিভাবে এই পর্বকে পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক পর্বের থেকে পৃথক বলা যায়। কেবলমাত্র 'সমবায়িক গবেষণা' এবং 'পেশাদারি উপযুক্ততা' এই দুই পর্বের মধ্যে পার্থক্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে বিষয়সূচী কে ঠিক করেছিল? যদি মনে করা হয় প্রান্তস্থলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে খুব সম্ভবত তা হয়েছিল কোনও 'সংঘাতের' ফলস্বরূপ।[২৪] এই 'সংঘাত', 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' বা 'মৈত্রীভুক্ত' এই শব্দগুলির মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকছে এবং এই শব্দগুলির মাধ্যমে 'সহযোগিতা', সমন্বয়, অছি ব্যবস্থা—এইগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এইসব উন্নত মানগুলি অবশ্য সবসময় রাষ্ট্রের রাজনীতি বা বিজ্ঞানের রাজনীতির মধ্যে সুস্পষ্ট নয়। 'দক্ষ সাম্রাজ্যবাদিতার' পর্বটি সবচেয়ে জটিল। বস্তুত কথাটি প্রকৃতিগতভাবে অর্থহীন। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যগগন অবস্থাকেই 'দক্ষ সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং যথার্থই হয়েছে কারণ সাম্রাজ্যবাদ 'দক্ষ' না হলে এত দীর্ঘস্থায়ী হ'ত না। একজন 'চেম্বারলিন' বা একজন র‍্যামস্যে, এদের বাগ্মিতা অবশ্যই মনোগ্রাহী, কিন্তু তার ফলাফল শূন্য।[২৫] ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিবেশন করেন এবং ঐ অধিবেশনগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ঐ অ্যাসোসিয়েশন ভারতবর্ষে কখনও আসেননি। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান ছিল পছন্দমাফিক। ভারতবর্ষ এবং আরও বেশ কয়েকটি উপনিবেশের ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব যতটা থাকার কথা তার থেকে অনেক বেশি দিন ছিল।

ম্যাকলিয়ড শহরকে (মেট্রোপোলিস) কেবল পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কলকাতা, সিডনি, মন্ট্রিল নিজস্ব অধিকারেই শহর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং নিজস্ব পরিধি তৈরি করেছে। এক বৃত্তের মধ্যে অন্য এক ছোট বৃত্তের উদ্ভব হয়েছে। শহরে (মেট্রোপলিটান) দৃষ্টিভঙ্গি তার খুঁটিনাটি সমস্ত আশা-আকাঙ্খা ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করতে অক্ষম। বস্তুত কোনও আদর্শের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তবুও ক্রমপ্রসরমান শহরের লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে তার একটি সুস্পষ্ট সীমার অনুপস্থিতি, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা যে পরিবেশ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও পরিবর্তিত করে তার স্বীকৃতি।

Scanned by CamScanner

একটি সুস্পষ্ট 'প্রান্তিক' দৃষ্টিভঙ্গির জোগান দিয়েছেন ইয়ান ইঙ্কস্টার।[২৬] তাঁর বক্তব্য যে একটি যথার্থ ঔপনিবেশিক আদর্শ তখনই গঠিত হতে পারে যখন স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যিক উভয়ের উপাদানগুলিই গণ্য হবে। তিনি পূর্ববর্তী আদর্শগুলি না মেনে সাম্প্রতিক উপনিবেশ (যথা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া), এবং তুলনামূলকভাবে আর্থিক অনগ্রসর উপনিবেশ, (যথা ভারতবর্ষ এবং জাপান) এই দুই-এর মধ্যে পৃথকীকরণ করেছেন। এরপর তিনি একটি পিরামিড আকারের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন, যেখানে (১) একটি বিস্তীর্ণ আর্থ-সামাজিক ভিত্তি আছে, (২) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামো আছে এবং (৩) একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কর্মসূচীও আছে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর ভিত্তি করে নির্মিত এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয়টি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ দুটিই ধরে রেখেছে এদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী, যা ইউরোপীয় শহরগুলি এবং ঔপনিবেশিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে একজোটে কাজ করছে।

কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ, সাম্প্রতিক (শ্বেতকায়) উপনিবেশের ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেলে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষে ও জাপানে নিজস্ব ঐতিহ্যগত আর্থ-সামাজিক ভিত্তি, এবং পরিকাঠামো ছিল যার সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সংঘাতের মধ্যে যেতে হয়েছিল এবং তাকে ভেদ করতে হয়েছিল। এই দেশগুলিতে প্রস্তরযুগ থেকে বাষ্পীয় যুগে উত্তরণ খুব দ্রুত হয়নি। এখানে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান এসেছিল কিছুটা সংঘাতের মধ্য দিয়ে, পক্ষান্তরে অস্ট্রেলিয়ায় তা এসেছিল পারস্পরিক ক্রিয়ার ভিত্তিতে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বাসাল্লার তৃতীয় পর্বে প্রবেশের পরও ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি থেকেই গিয়েছিল। প্রান্তস্থ বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রের থেকে স্থানগতভাবে দূরে ছিলেন, একই সঙ্গে তাঁরা স্থানীয় পরিবেশ থেকেও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অদ্ভুতভাবে, ইঙ্কস্টার একে বলেছেন 'আন্তর্জাতিক'।[২৭] এই অর্থে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কখনই 'আন্তর্জাতিক' ছিলেন না। স্থানীয় পরিবেশ, এবং ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ তাঁদের উপর চেপে বসেছিল। ঘটনাটিকে তিনি অন্যত্র বলেছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অবক্ষয়।[২৮] জাপান ও অস্ট্রেলিয়া এই সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতে পেরেছিল। সমস্ত পার্থক্যের একটাই কারণ। জাপান তার স্বাধীন অস্তিত্ব এবং উদার পরিবেশ (বিশেষত মেইজি পুনরুত্থানের পর)-এর জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানকে পরনির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।[২৯]

সম্প্রতি এস সাঙ্গওয়ান[৩০] এবং ডি. ভি. কৃষ্ণা[৩১] বাসাল্লার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের ভারতীয় অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করেছেন। সাঙ্গওয়ান ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীদের উপনিবেশবাদের কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। তিনি প্রচুর উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে মুনাফালোভী স্থানীয় সরকার, এবং গবেষণামুখী শহুরে পণ্ডিতবর্গ, এই দুই-

এর চাপে নিষ্পিষ্ট হলেও ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সফলভাবে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তিনি আবেদন করেছেন যে তাঁদের প্রচেষ্টাকে যেন অর্থহীন বা 'নিম্নস্তরের' বলে খারিজ করা না হয় (যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিকই তা করেননি)।[৩২] তাঁদের কার্যকলাপ অবশ্যই ঔপনিবেশিকতাবাদের শর্তাধীন ছিল, কিন্তু তা নিতান্তই ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র, কোনওমতেই কলঙ্কজনক নয়।

ডি. ভি. কৃষ্ণা অনুসন্ধান করেছেন যে প্রকৃত অর্থে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানী কাদের বলা যাবে এবং তাঁদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।[৩৩]

(১) 'দ্বাররক্ষকবৃন্দ'—যাঁরা বিজ্ঞানকে পরনির্ভরশীল করে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।
(২) 'বৈজ্ঞানিক সৈন্যবাহিনী'—যাঁরা কেবল তাঁদের বৃত্তিমূলক ভূমিকা পালন করে গেছেন।
(৩) জাতীয় বিজ্ঞানী—যাঁরা উদীয়মান জাতীয়তাবাদের পরিকাঠামোর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

'দ্বাররক্ষক', 'বৈজ্ঞানিক সৈন্যবাহিনী' এই শব্দগুলি কৃষ্ণা, রয় ম্যাকলিয়ডের থেকে অনুকরণ করলেও ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৩৪] তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী নয়, একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীই জাতীয় বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। এই সূত্র অনুসারে তিনি বাসাল্লার অনুমান অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব (স্বাধীন বিজ্ঞানের অবিকল্পিত অবস্থা) যে দ্বিতীয় পর্বের (ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান) মধ্যেই নিহিত, তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এর পাশাপাশি কৃষ্ণা আবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানকে, ঔপনিবেশিক প্রাসঙ্গিকতা (যেমন ঔপনিবেশিকতাবাদ ও উদীয়মান জাতীয়তাবাদ) থেকে বিচ্ছিন্ন করা ভুল। সুতরাং এই দুটি চিন্তাধারাকে একসাথে যুক্ত করলে বাসাল্লার দ্বিতীয় পর্ব এবং তৃতীয় পর্বের মধ্যে ভ্রূণস্তরের সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করা যায় না। জাতীয় বিজ্ঞানের গঠনতন্ত্র ঔপনিবেশিক বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোর বাইরে থাকলেও কোনওভাবেই ঔপনিবেশিক পরিবেশের বাইরে ছিল না। জাতীয় বিজ্ঞানের সমর্থক বা অন্য সকলেই কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থারই সৃষ্টি, এবং একথাও ঠিক যে তাঁদের অনেকেরই পশ্চিমি আদর্শ বা শিরোপার প্রতি যথেষ্ট নজর ছিল, অবশ্য নিজস্ব সিদ্ধান্ত বা পছন্দ অনুযায়ী। কৃষ্ণা কখনও তাঁর ত্রিস্তর বিভাজনকে কঠিন ভাবে দেখেননি। তাঁর মতে সম্ভবত ১৯২০ সালে জাতীয় বিজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। তখন অবশ্য ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতার বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে এসেছে।

মেক্সিকোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডি, ডব্লিউ, চেম্বার্স এই পরিবর্তনগুলিকে পর্যায়ক্রমিক বিকাশ না বলে বরং বিভিন্ন চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীর জটিল সমাবেশ বলতেই পছন্দ

Scanned by CamScanner

করেন। তাঁর মত এবং যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ মত হচ্ছে "রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশেও ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান ঔপনিবেশিকই থাকতে পারে।"[৩৭] একটি সাম্প্রতিক রচনায় তিনি 'দেশ' বা 'জাতি' শব্দগুলি যথাসম্ভব কম ব্যবহার করে তার পরিবর্তে 'অঞ্চল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ তিনি জোর দিয়েছেন আঞ্চলিক জ্ঞান উৎপাদনের উপর।

তিনি লিখেছেন, 'বাসান্না মডেলে ইউরোপের একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রের অস্তিত্বকে সমস্যাজনক নয় বলেই মনে হয়েছে; অঞ্চল-ভিত্তিক মডেলে কেন্দ্র/প্রান্ত ভিত্তিক বিভাজনের অস্তিত্বেরই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং এর সাথে সাথে প্রতিটি অঞ্চলে বিজ্ঞানের সংস্থাপন এবং পরিলক্ষিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।'[৩৮]

যন্ত্র ও যুক্তি

কেন্দ্র/প্রান্ত আদর্শগুলি মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিক বিনিময়, পারস্পরিক সম্পর্ক, পেশাদারিত্ব, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নিয়েই কাজ করে গেছে। কিন্তু এখানে দুটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রশ্ন দুটি ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে প্রযুক্তি বা যন্ত্র এবং মৌল বিজ্ঞান (যুক্তি?)-এর ভূমিকা ও স্থান নিয়ে। সকলেই জানে যে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে প্রযুক্তির উদ্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এমন কি কোনও প্রযুক্তিগত পরিবেশ হতে পারে যার ফলে সামাজিক ও অন্যান্য ঘটনা ঘটতে পারে? ইউরোপীয় বিস্তারের গতি নির্ণয়ে প্রযুক্তির ভূমিকা কতটা এবং তার পরিণতি কি?[৩৯] সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আরও কয়েকগুচ্ছ প্রশ্ন ওঠে 'সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের হিংস্রতা ও নীচতার মধ্যে মৌল বিজ্ঞানের আদি ও অকৃত্রিম বিশুদ্ধতা নিয়ে। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা কি শিক্ষা বা জ্ঞানকে কোনও কৌশলে পরিচালিত করেছিলেন, না কি—বিজ্ঞান উপনিবেশে প্রবেশ করে নিজস্ব আকারেই পরিবর্তন করেছিলেন? অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সাংস্কৃতিক (বা মহত্তর) উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে বোঝা যাবে?[৪০] ১৯৮১ সালে ডি, আর, হেড্রিকস তাঁর 'টুলস্ অফ এমপ্যায়ার'[৪১] গ্রন্থে প্রযুক্তিগত নির্ধারক সম্বন্ধে লেখেন। তাঁর বক্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের পরিণামে নয়, বরং অত্যন্ত অল্প মূল্যে এক অদম্য শক্তির উন্মোচন। প্রযুক্তিগত বিবর্তন ইউরোপীয় বিজয় অভিযানগুলির স্থান ও কালকে প্রভাবিত করেছিল এবং সেই সূত্রে ঔপনিবেশিকতাবাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কও নির্ধারণ করেছিল। এর ফলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার হয়েছিল দ্রুত, ব্যাপক এবং যথেষ্ট অল্প ব্যয়ে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, আফ্রিকা ভেদ করা হয়েছিল স্টিমার, কুইনাইন এবং দ্রুতগতির বন্দুকের সহায়তায়। তাঁর বই-এর পরবর্তী খণ্ডের নাম দিয়েছেন 'টেনট্যাক্লস্ অফ প্রগ্রেস',[৪০] এবং বইটিতে তিনি সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তার পরিণতির উপর জোর দিয়েছেন। বইটির শিরোনাম কিন্তু বিভ্রান্তিমূলক। 'সাম্রাজ্যবাদের স্পর্শ' কিভাবে 'প্রগতির স্পর্শ' হতে পারে?

বইটিতে হেড্রিকস ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে ইউরোপীয় প্রযুক্তির সার্থক স্থানান্তর, এবং উপনিবেশে প্রযুক্তি অনুযায়ী একটি সংস্কৃতি প্রচারের বিলম্ব ও ব্যর্থতা, এই

দুইয়ের মধ্যে যে তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানে প্রশ্ন, ইউরোপীয় প্রযুক্তির স্থানান্তর কি আদৌ সার্থক হয়েছিল? সম্ভবত না। এই ব্যর্থতার আংশিক কারণ প্রযুক্তি স্থানান্তর একটি কর্ম পরিকল্পনা হিসাবে করা হয়েছিল, প্রযুক্তি বিতরণের জন্য হয়নি এবং তার চিন্তাও হয়নি। অপর অংশটি হচ্ছে 'স্থানীয় প্রয়োজন', এবং 'স্থানীয় জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা' কখনই বিবেচনা করা হয়নি। হেড্রিকস ব্রিটিশ ভারতের দৃষ্টান্ত দিয়ে কারণগুলির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রিটিশ ভারতে কাঁচামালের অভাব ছিল না, স্থানীয় মানুষ পরিবর্তনের প্রতি বিমুখ ছিল না, মূলধনের অভাব ছিল না, কিন্তু যার অভাব ছিল সেটি হল একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারি মনোভাব। ঔপনিবেশিক স্বার্থ সবসময়েই প্রাচ্যের মনোভাবের দোষ দিয়েছে। তাদের বক্তব্য ছিল যে স্থানীয় মানুষদের কায়িক পরিশ্রম ও প্রযুক্তির প্রতি সংস্কারগত বিরাগ উপস্থিত। এটা কিন্তু কোনও 'কৈফিয়ৎ ছিল না, ছিল ওজর, হয়তো বা অস্ত্র।'[৪১] শাসকবর্গ দেশীয় প্রজাদের একটি নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত শিক্ষিত করতেন। পরবর্তী পর্যায়ের প্রযুক্তি শিক্ষা তাদের দেওয়া হত না। প্রযুক্তি বিস্তারের আর একটি উপায় ছিল উদ্যোগ বা অভিজ্ঞতার সাহায্যে। রেলগাড়ি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, প্রযুক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে এর বিশেষভাবে অংশগ্রহণ কার সম্ভব ছিল না। দেশীয় (অ-ইউরোপীয়) প্রজাদের (মোটামুটি) নিম্নস্তরের চাকুরিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। শিল্পোদ্যোগীর অভাব ছিল না কিন্তু যারাই উপরে উঠতে গেছেন (যেমন জে, আর, ডি, টাটা), তাঁরাই বুঝতে পেরেছিলেন যে উন্নতির পন্থা রাজনীতির মধ্য দিয়ে। ব্যবসা বাণিজ্যের মতো প্রযুক্তিও এসেছিল 'পতাকার অন্তরালে', সুতরাং রাজনীতিই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।[৪২] পরিণামে, এই ধরনের উপনিবেশগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবৃদ্ধি হয়েছিল, কিন্তু উন্নতি হয়নি। এই বিশ্লেষণ মেনে না নেওয়া শক্ত।

মাইকেল এ্যাডাসের রচনায় আর্থিক এবং প্রযুক্তি সর্বস্বত্বার (ডিটারমিনিজম) ওপর ঝোঁক কম—তিনি ইউরোপীয় উপনিবেশিক কিসের নিরিখে অ-পশ্চিমি মানুষের কার্য ও কর্মক্ষমতা নিরূপণ করতেন তার বিচার করেছেন।[৪৩] তাঁর অনুসন্ধানের ভিত্তি ছিল অজস্র ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং সমসাময়িক ইউরোপীয়ানদের বর্ণনা। তাঁর বক্তব্য ছিল সভ্যতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ধারণার কেন্দ্রে ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তবে তিনি মেনে নিয়েছেন যে 'সম্পৃক্ত রচনায় জাতি-বিষয়ক ধারণা, কৃতকৌশলের তুলনা কিংবা মৌল ভাবনার সংহতির থেকেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে', তা সত্ত্বেও তিনি 'জাতিগত ক্ষুদ্রতাবাদ থেকে সরে আসার' জন্য আবেদন করেছেন এবং বলেছেন যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, যেমন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি, যা দিয়ে পাশ্চাত্যের বাইরের মানুষদের বিচার করা হত, সেগুলিকে বেশি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন।[৪৪]

তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল ইউরোপীয়দের 'ভাবনাচিন্তা এবং আচার আচরণ', বিস্তারের প্রক্রিয়া নয়। ইউরোপের বাইরের লোকেরা তাদের 'অপরপক্ষ'-কে কোন দৃষ্টিতে দেখত

Scanned by CamScanner

সে সম্বন্ধেও কোনও অনুসন্ধানই করেননি তিনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ঔপনিবেশিকদের 'সভ্য বা উন্নত করার ব্রত' সম্বন্ধে যে চিন্তাধারা ছিল তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে গিয়ে তিনি উপনিবেশের মানুষরা সে বিষয় কী চিন্তা করত তা নিয়ে কোনও আলোচনাই করেননি।[৪৩] তিনি এক বিশাল ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কাজ করেছেন কিন্তু তাঁর একটি বিশেষ উৎসের উপর পরম নির্ভরতা তাঁর বিশ্লেষণকে একমুখী করে তুলেছে। হেড্রিকস এবং অ্যাডাস উভয়েই মনে করেছেন যে বৈজ্ঞানিক নির্ভরতা এবং প্রযুক্তিগত নির্ভরতা একই মুদ্রার দুই পিঠ। তাঁদের এই ধারণা আফ্রো-এশীয় প্রসঙ্গে যথার্থ হলেও অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার ক্ষেত্রে নয়। জ্যান্ টড্ তাঁর অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কিভাবে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে মেধার সৃষ্টি করেছিল, যা দিয়ে তাঁরা একটি নতুন প্রযুক্তিগত পদ্ধতি তৈরি না করে বিদেশী প্রযুক্তিরই মূল্যায়ন করেছেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করে স্থানীয়ভাবে গ্রহণ করেছেন।[৪৪] সুতরাং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক হিসাবে কোনও নতুন জ্ঞান সৃজনের দরকার হয়নি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামোর সরাসরি স্থানান্তর প্রায় কিছুই হয়নি। ফলস্বরূপ দেখা গেছে উদ্যোগগুলিতে উন্নতির প্রেরণা সব সময় 'উপর থেকে নীচে' না এসে 'নীচে থেকে উপরে' এসেছে।[৪৫] এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা গেছে ব্রিটিশ ভারতে যেখানে এক মাথাভারী শাসনযন্ত্র, উন্নতি বিধানের জন্য 'উপর থেকে নীচে' নীতিকেই উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে।

প্রযুক্তির 'স্থানান্তরণ' এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের 'শ্রেণীবিন্যাস' উভয়ের ভিতরেই একটি সুস্পষ্ট অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু আছে। কিন্তু নিশ্চিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি একথা খাটে? লিউইস পিয়েনসন 'নিশ্চিত' বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণ করেছেন। তিনি যুক্তিদ্বারা দেখিয়েছেন মৌলবিজ্ঞান এর বিবেচনাক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। তিনি এও বলেছেন যে কলা এবং ধর্মের মতো তা সংস্কৃতি-নিয়ন্ত্রিত নয়। জার্মান ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদী পরিবেশে ভৌতবিজ্ঞান, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিফলনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না।[৪৮, ৪৯] তিনি মেনে নিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদীরা ভৌতবিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদদের গবেষণার জন্য অর্থ ব্যয় করেছিল তাদের বিনিয়োগের ফসল তোলার আশায়। কিন্তু মৌলবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের সুদূর দেশের জন্য খ্যাতি বা মর্যাদা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনের জন্য এই ধরনের বিজ্ঞানচর্চা বা তার ফলাফলের কোনও রূপান্তর হয়নি। সাগরপারের যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খ্যাতি ও মর্যাদার আসনে বসেছেন, তাঁরা সকলেই এই সব ঔপনিবেশিক, যারা শহরে ক্ষুধার প্রয়োজনে সাগর পেরিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়েছিল, তাদের থেকে দূরে থাকতেন।[৫০] এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই পিয়েনসন (সমকোণী অক্ষরেখার ভিত্তিতে) নীচের আদর্শের রূপ দিয়েছেন—

(১) ক্রিয়ামূলক অক্ষ— যেখানে দেখানো হচ্ছে যে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা প্রথমত এবং প্রধানত উপনিবেশের কার্যভারবাহী।

(২) গবেষণামূলক অক্ষ—যেখানে গবেষণাই হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি।

(৩) বাণিজ্যিক অক্ষ— যেখানে বিজ্ঞানীরা ব্যবসায়ের স্বার্থে কাজ করেন।

প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে পিয়েনসন নির্ধারণ করেছেন যে, ফরাসীরা ক্রিয়ামূলক অক্ষের অন্তর্গত,[৫১] জার্মানরা গবেষণামূলক অক্ষের এবং ব্রিটিশরা বাণিজ্যিক এবং গবেষণামূলক উভয় অক্ষেরই অন্তর্গত। ওলন্দাজরা তিনটি ক্ষেত্রেই সমান শক্তিশালী।

পিয়েলসন ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করেছেন। সুদূর কোনও উপনিবেশের মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপনের সাথে অর্থার্জনের বা ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির স্পষ্ট কোনও যোগাযোগ নেই, এবং কোনও কৃষি সংক্রান্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে অবশ্যই কোনও তুলনা চলে না। কিন্তু এই ধরনের মানমন্দির বা আবহকেন্দ্র নৌবাহিনীর সাহায্যে আগত এবং নৌবাহিনী উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করত। ১৮৯০ সালে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন একজন সিভিল ইনজিনিয়ার, এবং ছাত্ররাও ছিলেন সকলেই সিভিল ইনজিনিয়ার। আরও দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ভৌত বিজ্ঞানের সেই শাখাগুলির পঠন পাঠনে উৎসাহ দেওয়া হত, যেগুলির সাথে বিদ্যুৎ প্রযুক্তির সরাসরি সম্পর্ক আছে।[৫২] পিয়েনসন এই বিষয়গুলির অবমূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য থেকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। উপনিবেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির 'এক বিশেষ চরিত্র' ছিল এবং এই হল ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান।

অবশ্যই স্থানীয় ভিন্নতা থাকতেই পারে, কিন্তু এই ধরনের ভিন্নতা কি মূল চরিত্রের কোনও পরিবর্তন আনে? ১৯০৩ সালে এমিল উইখার্ট নামে গটিংগেনের এক ভূপ্রকৃতিবিদ একগুচ্ছ ভূকম্পনিক কেন্দ্র স্থাপন করতে চান। তাঁর মতে এই কেন্দ্রগুলি স্থাপন না করলে জার্মানি যেমন উপনিবেশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল, তেমনই গবেষণার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়বে। 'আমাদের উপনিবেশগুলিতে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবলম্বন নয়, বৈজ্ঞানিক অবলম্বনও খুঁজতে হবে'।[৫৩] এর থেকেই প্রমাণ হয় লক্ষ বা উদ্দেশ্য একটিই ছিল। পিয়েনসন নিজেই উল্লেখ করেছেন 'জার্মান কর্তৃপক্ষ শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞদের সামোয়া এবং বুয়েনস আয়ার্সে পাঠায়নি।' তাদের কাছে প্রাকৃতিক জ্ঞানও রাজনৈতিক শক্তির আনুষঙ্গিক ছিল।

শিরোনাম : মূল কেন্দ্রে

জার্মান ও ওলন্দাজ উপনিবেশগুলির বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে সেখানকার শহরে ঔপনিবেশিকদের নির্জন, নিঃসঙ্গ জীবনকে আলোকিত করেছিল, কিন্তু এই উচ্চতর জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে কতটুকু জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ধরনের দূরবর্তী ছোট ছোট ঔপনিবেশিক ঘাঁটিগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পররাষ্ট্র পরিবেষ্টিত হয়েই থাকত। একমাত্র ভারতবর্ষ ও আর্জেন্টিনা বাদে অন্য

Scanned by CamScanner

উপনিবেশগুলি বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয় এবং অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকত। এই 'রূপান্তরে'র অভাবই হচ্ছে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের নঞর্থক দিক তা সে জার্মানই হোক বা ওলন্দাজই হোক। আমি মনে করি ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা নিজস্ব অসুবিধা ও অস্বচ্ছন্দতা সত্ত্বেও দ্বৈতসত্তা পালন করতে বাধ্য হত—ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সেবক হিসাবে এবং বিজ্ঞানের সেবক হিসাবে। এই রাষ্ট্র যেমন পরিকাঠামো, ক্ষমতা, জাতি ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করত। বিজ্ঞানও তেমনি জ্ঞানের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করত এবং এই সমস্ত কাজ ছাড়াও উপনিবেশগুলিকে 'অন্যান্য' জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করতে শেখাত। সুতরাং উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন হত এবং উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের অভাব ছিল। ঔপনিবেশিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী এর রূপরেখা টানা হত। এর নিজস্ব ক্ষমতাও ছিল সীমিত এবং ঔপনিবেশিকতার মুষ্টি ক্রমশ দৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে এই ক্ষমতাটুকুও হ্রাস পেতে শুরু করল। সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের উপর এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকল। বস্তুত, 'রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানী' এই ধারণাটির জন্ম হয়েছিল উপনিবেশ থেকেই।[৪৪] অবশ্য ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান যে সব সময়ই 'আহুত' এ কথা মনে করা কোনও কারণ নেই। বহু দৃষ্টান্ত আছে যার থেকে দেখা যায় যে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বেশ কিছু মৌলিক কাজ করা হয়েছে এবং সেগুলি ব্যাপকভাবে স্বীকৃতও হয়েছে। বহু সময়ে কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও নানারকম কাজ করা হয়েছিল যেগুলি কখনও কখনও উপনিবেশের নগরকেন্দ্রগুলির (মেট্রোপলিস) কাজে লেগেছে।[৪৫] উপনিবেশের প্রথম যুগে কিন্তু ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের কাজ স্বতন্ত্রভাবেই করতে পারতেন। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং খনি বিষয়ের এখন নতুন বিশাল পৃথিবী তাঁদের সামনে উন্মোচিত হল। কিন্তু ঔপনিবেশিক মুষ্টির দৃঢ়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ক্রমশ সরকারের কুক্ষিগত হয়ে পড়তে লাগল।[৪৬] সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' আরও উপযোগিতা ভিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। স্বয়ং ব্রিটেনেই বিজ্ঞান ধীরে ধীরে কর্মতৎপরতার থেকে কর্মপ্রচেষ্টার দিকে এগোতে থাকল। শিল্প বিপ্লবের পিছু পিছু এল এক নতুন চিন্তাধারা যাকে বেরম্যান বলেছেন বিজ্ঞানের বৈষয়িক চিন্তাধারা।[৪৭] বেকন ও বেনথ্যাম উভয়েই একমত যে বিজ্ঞানে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা অনেকেই ফলদায়ক এবং উপযোগিতামূলক বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করলেন।

রাষ্ট্র এবং তার অর্থনৈতিক আবশ্যকীয়তাকে কেন্দ্রীভূত করার কারণ এই নয় যে, ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানকে ইউরোপের রাজনৈতিক বা বাজার শক্তির পরিণতি হিসাবে দেখানো। অর্থনৈতিক শর্তগুলি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক, কিন্তু শর্তগুলি কখনই এককভাবে বিচার করা উচিত নয়। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক শর্তাবলী এবং পূর্বোক্ত শর্তবলী কখনই বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না। বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাসবিদদেরও

এই মত। যদিও তাঁদের কেন্দ্র/প্রান্ত ব্যাখ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে। বস্তুত যে ক'টি আদর্শ-এর আগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির কেন্দ্রবিন্দুতেই আছে এই সম্পর্ক। চেম্বার্স এই কেন্দ্রবিন্দুকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে 'এটি এমন একটি পরিকাঠামো যার সাহায্যে জ্ঞান উৎপাদনের, এবং জ্ঞান আদান প্রদানের প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়।'[৪৮] হ্যানকক মনে করেন না যে এটি ভূগোলের স্থবির অংশ বরঞ্চ একে নমনীয়, চলমান এবং বিকিরণশীল বলা চলে। 'চলমান কেন্দ্রকে অনুসরণ এমনই একটি খেলা যা নিজস্ব সমাজের বাইরে অন্য সমাজে খেলা যেতে পারে।'[৪৯] এখানে প্রশ্ন 'অন্য' খেলোয়াড় বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

এর থেকে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সাংস্কৃতিক সংঘাতের জগতে। এর চরিত্র বা তারতম্য, কর্তৃত্বস্থাপনের কৌশলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রবিনসনের মতে সাম্রাজ্যবাদিতা 'ইউরোপের রাজনীতি বা অর্থনীতির থেকে অনেক বেশী প্রতিভাত হয় আফ্রো-এশিয়ান রাজনৈতিক কার্যকলাপে'।[৫০] ঔপনিবেশিকতার শিকার যারা হয়েছিল তাদের সহযোগিতা বা অসহযোগিতার উপর ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান কি নির্ভরশীল ছিল? না কি নব্য প্রান্তিক গোষ্ঠী শহরকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের মধ্যেই ফাটল ধরাতে পেরেছিল? এই ধরনের বক্তব্য নিশ্চয়ই রাখা যায় যে ঔপনিবেশিকতার ব্যাপক ও শক্তিশালী প্রভাব সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সৃজন, বিস্তার বা গ্রহণ ক্রমশই স্বতন্ত্রতা এবং নিজস্ব গতিবেগ অর্জন করতে পেরেছিল। উপনিবেশের সকলেই কিন্তু নিজেদের ঔপনিবেশিকতার শিকার বলে মনে করেননি। তাঁদের চিন্তাভাবনা স্থান কাল অনুসারেই বিবর্তিত হত। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা উপনিবেশে কোনও চিন্তা ভাবনার সৃজন হয়নি, সবটুকুই বিদেশ থেকে আমদানি করা। এমনকী যদি ধরে নেয়া যায় যে চিন্তাভাবনার আমদানি হয়েছিল, তাহলেও সেগুলি কিন্তু 'পরিপূর্ণ সামগ্রী' হিসাবে আমদানি করা হয়নি এবং সোজাসুজি ব্যবহার করা হয়নি।[৫১] সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে পরিমার্জিত বা রূপান্তরিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, যে মূল চিন্তার সাথে তাদের কোনও মিলই ছিল না। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে কিভাবে ঘটনাগুলি ঘটেছিল এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা সমীকরণের ক্ষেত্রে এর কি প্রভাব পড়েছিল? যদিও ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক একীকরণের কোনও স্থান নেই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহ্যের একসাথে এগিয়ে চলার চেষ্টাও হয়েছে। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যাখ্যান মানেই সেই সময়কার সমস্ত চিন্তা ভাবনা বা সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যান, তা কখনই ঠিক নয়।[৫২] এই দুই সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা মধ্যস্থ ছিলেন তাঁদের পরিশ্রম, তাঁদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সমস্তই কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিসীমার মধ্যেই নির্দিষ্ট ছিল। তারাই শেষপর্যন্ত ঔপনিবেশিকতার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। তাঁরাই ছিলেন এক নতুন যুগের পথপ্রদর্শক যেখানে বিজ্ঞান 'স্বাধীন ও স্বাবলম্বী'।[৫৩] 'স্বাধীন' বিজ্ঞান এবং তার

Scanned by CamScanner

জন্য 'সংগ্রাম' অবশ্যই স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন। কিন্তু কার বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম'? নিশ্চয়ই ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে। সুতরাং এদের স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। একটি সামগ্রিক পরিক্রমার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ই তুলে ধরা উচিত এবং বিশ্লেষণ করা উচিত।

সংক্ষেপে, সাম্প্রতিক একটি রচনায় যে ঔপনিবেশিকতার 'সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের' উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিকাশের পথে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ঔপনিবেশিকদের মতে এই 'কেন্দ্র' হচ্ছে 'প্রাকৃতিক ইতিহাসের' একটি অপরিহার্য অধ্যায় এবং তাঁদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও যুক্তির ফলস্বরূপ অপরপক্ষে যাঁরা ঔপনিবেশিকতার শিকার তাঁদের মতে এটি হচ্ছে 'সংকীর্ণতা', 'জাতিবৈষম্যমূলক' এবং 'ঔদ্ধত্য'। তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী এর যৌক্তিকতার খোঁজ করেছেন। এই শাসক-শাসিতের বিরোধের শত হস্ত দূরে থেকে ঔপনিবেশিকোত্তর বিতর্ক চলছে বিষয়টির বৈপরীত্য, বিচ্ছিন্নতা ও অসঙ্গতি নিয়ে। এই ধরনের জটিল পরিস্থিতির কোনও সরল ব্যাখ্যা দেওয়া বৃথা।

প্রাক-ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের অবস্থান নির্ণয়—ভারতীয় দৃষ্টান্ত

প্রাক-ঔপনিবেশিক ইতিহাসের পুনর্গঠন করার জন্য এবং উপনিবেশ পত্তনের পদ্ধতির উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের ভূমিকা কী ছিল তার সঠিক মূল্যায়নের জন্য প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের কিছু কিছু অঞ্চল, ও সেখানকার সংস্কৃতির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন। 'ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান' সম্পর্কে কোনও বিশ্লেষণই সম্পূর্ণ হবে না যদি না প্রাক-ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তার অজ্ঞানতা, তার দোষত্রুটি, সীমাবদ্ধতা, যথার্থতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়।

এমন নয় যে পণ্ডিতমহল এই সব সমস্যার দিকে নজর দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ধূসর জায়গা থেকে গেছে, সেগুলির সম্বন্ধে কিছু নির্দিষ্ট বা নির্ভরশীল মন্তব্য করা বর্তমান গবেষণার উপর দাঁড়িয়ে সম্ভব নয়। যাইহোক এই ব্যাপারে মোটামুটি তিনটি মুখ্য অভিমতকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়েন বেশিরভাগ সমকালীন ইউরোপীয় পর্যটক ও পরবর্তী বেশ কিছু ব্রিটিশ আবিষ্কারক ও পণ্ডিত, যাঁদের মতে তৎকালীন ভারতবর্ষের সবকিছুই 'অন্ধকারময় ও বিবর্ণ'। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদীরা, যারা প্রাক ঔপনিবেশিক ভারতের বিজ্ঞানের কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী। তৃতীয় ধারার মতবাদীরা বেশ সতর্ক পদচারণা করেছেন, এবং মন্তব্যও করেছেন বেশ সাবধানে। এই সমস্ত মতবাদগুলি কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, যেমন সাংস্কৃতিক অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; স্থান ও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তনের চরিত্র ও

পদ্ধতি; কোনও বৈজ্ঞানিক প্রবর্তন কোনও জটিল সাংস্কৃতিক প্রসারণ অথবা সাধারণ ভৌগোলিক স্থানান্তরের নানা কারণ; রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা; বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবক বা প্রসারকের কার্যকারণের স্থানকাল ও পদ্ধতি; গ্রহণ, বর্জন, ঔদাসীন্য বা ক্রমান্বয়িক আত্মীকরণের জটিল পদ্ধতি ইত্যাদি। এই পর্যন্ত বিষয়গুলিকে একটিমাত্র সূত্র বা ব্যাখ্যা বা মডেলের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মানবিক প্রয়োজন সতত পরিবর্তনশীল। এক বিশেষ সংস্কৃতি বা সময়ের উপযোগী এক বিশেষ প্রযুক্তি বা একগুচ্ছ প্রযুক্তি অপর কোনও সংস্কৃতি বা সময়ের উপযোগী নাও হতে পারে।

কিন্তু এইসব সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য বা পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিষয়গুলি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে, আর তার থেকে অনেক গুরুত্বেরও প্রকাশ হতে পারে। তবে এই ধরনের আলোচনার পশ্চাৎপটে সব সময়েই ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা গভীরভাবে বিরাজ করে। অবশ্য এ কথাও ঠিক নয় যে আধুনিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি পাশ্চাত্য উৎপাদনমুখী সাংস্কৃতিক মতবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম, যদিও তা আংশিকভাবে সত্য। এর পাশাপাশি নিজস্ব মতবাদের ভিত্তিতে কোনও ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বা চৈনিক কিংবা আরবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা নিশ্চয়ই চিন্তা করা যেতে পারে। কিংবা আরও সঙ্গতভাবে প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক কর্মধারার একটি মূল প্রবাহের ধারণা করা যেতে পারে, যেখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ইউরোপের রেনেশাঁসে যে বিশাল পরিবর্তন এসেছিল তার উৎস হিসাবে বেকন তিনটি উদ্ভাবনকে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল মুদ্রণ, বারুদ এবং চুম্বক দিক্ নির্ণয় যন্ত্র। এগুলির কোনওটিই কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার অবদান নয়। সবগুলিই চৈনিক উদ্ভাবন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই আবিষ্কারগুলি কিন্তু ইউরোপীয় রচনা যুদ্ধবিদ্যা ও নৌবিদ্যার ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘটিয়েছিল চীনের ক্ষেত্রে নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ইউরোপ কেন এত দ্রুততার সঙ্গে এগুলিকে গ্রহণ করে নিয়েছিল? বাসাল্লার মতে ইউরোপীয় সভ্যতা একমুখী ছিল না এবং ইউরোপীয়রা কখনই নতুন চিন্তাধারা বা বিষয়কে গ্রহণ করতে পিছিয়ে যায়নি, বরং তাদের সারগ্রাহী বলা চলে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। বাসাল্লা আরও পরিষ্কার করে বলেছেন যে প্রযুক্তিগত বিবর্তনগুলি নির্বাচন করেন কিছু সক্রিয়, সৃজনশীল স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু তাঁদের যে সমাজের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে বা জনহিতাকাঙ্খী হতে হবে এমন কোনও আবশ্যকতা নেই। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে কি এ ধরনের কোনও সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন?

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের বেশ কিছু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পেশাগতভাবে যন্ত্রনির্মাতা ছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কখনও একমুখী ছিল না। আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের সামর্থ্যের ওপর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ। চালু হয়েছিল বৈজ্ঞানিক সমাজ এবং বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকা। উপরোক্ত ঘটনাগুলি ইঙ্গিত করে এক নতুন বৈজ্ঞানিক মনোভাবের। প্রচলিত ধ্যানধারণা,

Scanned by CamScanner

প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান, বিদ্যা-শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল এবং কারিগরি কুশলতা ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান, যার বিবর্তন হয় অত্যন্ত মন্থরগতিতে, তার সঙ্গে এই নতুন মনোভাবের বিস্তর পার্থক্য।[১০]

সমসাময়িক পর্যটকদের রচনাবলী থেকে জানা যায় যে, এই ধরনের বিবর্তনের কোনও প্রতিফলন ভারতবর্ষে হয়নি। তাঁদের লেখাগুলিতে কেবল 'প্রাচ্য মনোভাব' এবং উদ্ভাবন বা বিবর্তনের প্রতি ভারতীয় বিরূপতার গল্পই আছে। সমকালীন ইউরোপীয় পণ্ডিতমহল ও বংশপরম্পরায় এই ধারণায় আচ্ছন্ন ছিলেন। যদিও এই রচনাগুলি প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর কিছু আলোকপাত করে,[১১] ভারতের বস্ত্রশিল্প, ইস্পাত নির্মাণ প্রণালী, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এই সমস্ত পর্যটকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের অধিকাংশ রচনাই শুরু হয়েছে বিস্ময় ও প্রশংসা দিয়ে কিন্তু শেষের দিকে সন্দেহ আর ঔদ্ধত্যের ছাপ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গুণকীর্তন করে বলা হয়েছে 'বিজ্ঞানে তাঁদের অসাধারণ প্রগতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ' এবং ত্রুটিহীনতার দিক দিয়ে তা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সমমানের।[১২] মানমন্দিরগুলিকে 'বিগত দিনের বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিশাল ধ্বংসাবশেষ' হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু তারপরেই ধেয়ে আসছে অভিযোগ, 'মূল তথ্য সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছাড়াই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নিয়মে কাজ করা হয়, ...ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি অত্যন্ত সাধারণ ও স্থূল'।[১৩] ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত সমালোচনা হচ্ছে—

(১) 'কোনও তথ্য সরবরাহ করে না এমনকী মহাজাগতিক কোনও ঘটনার কোনও বর্ণনা দেয় না, কেবলমাত্র নভোমণ্ডলের কিছু পরিবর্তন, মুখ্যত সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে কিছু গণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ।'[১৪]

(২) ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা চিরাচরিত ঐতিহ্যগত রীতিতেই সন্তুষ্ট। তাঁরা কোনও উন্নতির বিষয় চিন্তা করেন না এবং পৌরাণিক বা সিদ্ধান্তিক রীতিনীতির কোনও সমালোচনা সহ্য করেন না।

অধিকাংশ পর্যটকরাই লিখে গেছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়রা গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার অধঃপতন হয়। পরবর্তীকালের ব্রিটিশ এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকরা কোনওরকম সমালোচনা ছাড়াই এই তথ্যটি মেনে নেন। এর ফলে এই ধারণারই সৃষ্টি হয় যে একমাত্র প্রাচীন ভারতেই বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছিল মধ্যযুগীয় ভারতে নয়।[১৫] অবশ্য, রহমান, ধর্মপাল, আলভারেস এবং আন্দারী, এই সমস্ত পণ্ডিতরা এই ধারণার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন। রহমান একটি বই লিখেছেন, 'সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে উৎস বস্তুর পুস্তক বিবরণী' (বিবলিওগ্রাফি অফ সোর্স মেটিরিয়ালস ইন স্যানস্কৃট, অ্যারাবিক অ্যান্ড পারসিয়ান)। তিনি বইটিতে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সাহায্যে

প্রমাণ করেছেন যে, মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে আগাগোড়াই গভীরভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা চালানো হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যদিও বেশির ভাগ অবদান ছিল জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে, তবুও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ হয়েছিল। তৃতীয়ত, বিজ্ঞানের সাধারণ ব্যাপারে অবদানের পাশাপাশি বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের রচনা ও প্রবন্ধ (গবেষণামূলক) পাওয়া যায়। বইটির পুস্তক বিবরণীতে প্রচুর সংখ্যক পাণ্ডুলিপি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কেবলমাত্র জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেই ফারসি ভাষায় ৪১১টি পাণ্ডুলিপি সংযোজন করা হয়েছে, যেগুলি মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় দশম থেকে ঊনবিংশ শতকের। এরমধ্যে আবার ৩২টি আছে অষ্টাদশ শতকের। আরবি ভাষার ৩৪৬টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে ২২টি লেখা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডুলিপিই সর্বাপেক্ষা বেশি ২১৩৬টি, যার মধ্যে ১৯০টি সপ্তদশ শতকের এবং ৩৭টি অষ্টাদশ শতকের। পাণ্ডুলিপিগুলির বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিচার করলে দেখা যায় ফারসি ভাষার ৩২টি পাণ্ডুলিপির ১১টি সাধারণ বিষয়ের, ১টি বিশেষ ধরনের, ২টি টীকাটিপ্পনি, ২টি অনুবাদ এবং ৬টি পঞ্জিকা। আরবি ভাষার ২২টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে ৮টি বিশেষ ধরনের, ৬টি টীকাটিপ্পনি এবং ৮টি পঞ্জিকা আর সংস্কৃত ভাষার ৩৭টির মধ্যে ৩টি সাধারণ ব্যাপারে, ১৫টি বিশেষ ধরনের, ৮টি টীকাটিপ্পনি, ২টি অনুবাদ, ৪টি কাব্য সঞ্চয়ন এবং ৫টি পঞ্জিকা।[১৬] তালিকাটি যথেষ্ট গভীর এবং উল্লেখযোগ্য হলেও এর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের প্রগতির কতটুকু বীজ আছে তা যাচাই করার জন্য আরও বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতকে জ্যোতির্বিদ্যার উপর সোয়াই জয় সিংহের একটি কাজ যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে। জয় সিংহ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনার, বিশেষত সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের, সিদ্ধান্তিক এবং গ্রীকো-আরবিক সময়সূচির মধ্যে পার্থক্য থাকে কেন এবং কেনই বা বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। তিনি বেশ কিছু পঞ্জিকার সাহায্য নিয়েছিলেন এবং প্রচুর স্থানীয় পণ্ডিত ও বিদেশী পর্যটকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক গণনায় (পিতলের যন্ত্র) উৎসাহিত ছিলেন না, তিনি মনে করেছিলেন আরও বড়মাপের মানমন্দিরের (পাথরের) সাহায্যে আরও নির্ভুল ফলাফল পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী, জয়পুর, মথুরা এবং বারাণসীতে মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। একজন ফরাসি যেসুইট তাঁকে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সুসম্বদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলির উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি তাঁর পণ্ডিতদের মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় পাঠিয়েছিলেন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের তাঁর রাজসভায় নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তাঁর এই সমস্ত প্রচেষ্টা জিজ-ই-মুহাম্মদ সাহী গ্রন্থে (১৭২৮) লিপিবদ্ধ করা আছে। বইটি মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে ধরা হয়। বইটির উপর

Scanned by CamScanner

প্রচুর টীকাটিপ্পনিও লেখা হয়েছে। জয় সিংহ তাঁর 'জিজ'-এ তিনটি (ইসলামি, ব্রাহ্মণ্য ও ইউরোপীয়) ঐতিহ্যের কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু পাথরের যন্ত্রাদি (ইউরোপীয় ঐতিহ্যের বাইরে) তার নির্ভরতা, পঞ্জিকা, নির্ভুলতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর সংস্কার সাধারণভাবে প্রমাণ করে যে তাঁর মনোভাব ছিল মধ্যযুগীয় এবং টলেমির ধ্যানধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রহমানের মতে জয় সিংহের প্রকৃত মতবাদ তা ছিল না। 'জয় সিংহ কখনই নিজেকে কোপার্নিকাস বা কেপলার-এর কাছে সম্পূর্ণভাবে ঋণী বলে মনে করেননি, কেবল তাঁদের তথ্যগুলি মেনে নিয়েছিলেন।' রহমান এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সবিরভের কৃত 'জিজ'-এর ফারসি থেকে রুশভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে।[১৭] সবিরভ জয় সিংহকে উদ্ধৃত করে বলেছেন :

হিপারকাস, টলেমি এবং অন্যান্য যাঁদের জ্যোতির্বিদ্যার পূর্বপুরুষ হিসাবে ধরা হয়, তাঁরা গ্রহগুলির গতিবিধির মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন এবং এই গতিবিধির কক্ষপথের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বর্ণনা আদৌ নির্ভুল নয়। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে গ্রহগুলির পরিক্রমণই নির্ধারণ করে বিশ্বজগতের গঠন, কিন্তু এই পরিক্রমণ পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদের মতানুসারে হয় না। গ্রহাদির পরিক্রমণের কক্ষপথের রূপ ভিন্নতা সর্বোপরি উল্লেখ্য ঘটনা হচ্ছে কক্ষপথের রূপ হচ্ছে উপবৃত্তাকার যার কেন্দ্রে আছে সূর্য।

জয় সিংহ যে চিরাচরিত ধ্যানধারণা এবং গভীর সংস্কারের বাইরে গিয়ে কোপার্নিকাসের মতবাদ গ্রহণ করেন তার থেকেই প্রমাণ হয় তিনি কতটা উদার মতাবলম্বী এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন।[১৮] সবিরভ জয় সিংহ সম্বন্ধে প্রশংসা করে বলেছেন যে তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছেন। 'জিজ' এ লেখা আছে : আমাদের কারিগররা এত দক্ষতার সঙ্গে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছেন এর সাহায্যে মধ্যাহ্নের আকাশেও উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় তারাও লক্ষ করা যায়। এই ধরনের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অমাবস্যার চাঁদকে তার রশ্মি বিচ্ছুরণের নির্ধারিত সময়ের আগেই দেখা সম্ভব। এমনকী এর সাহায্যে চাঁদকে তার অদৃশ্য অবস্থাতেও দেখা যায়।[১৯] তথাকথিত 'স্থির তারাদলে'র বিষয়েও জয় সিংহ ঐতিহ্যগত গ্রীকো-আরবিক জ্যোতির্বিদ্যার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। টলেমির জ্যোতির্বিদ্যায় তারামণ্ডলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, গতিময় তারাদল এবং স্থির তারাদল। 'জিজ'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে জয় সিংহ এই তথ্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে 'জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় যে তারাগুলিকে 'স্থির তারাদল' বলা হয়েছে বাস্তবে তারা আদৌ নিশ্চল নয়। তাদের গতিবেগও একই হারে হয় না বরঞ্চ বিভিন্ন গতিবেগেই তারা চলে।'[২০] রহমানের অনুমান জয় সিংহ বিজ্ঞানের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এক নবযুগের উন্মেষ করতে চেয়েছিলেন। অপর এক পণ্ডিতের মত নবজাগরণের (বিজ্ঞানের বিপ্লব) পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঔপনিবেশিকতার ভীতি।[২১] বেশ কিছু পণ্ডিতরা আবার এই ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্যায়নের

পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে জয় সিংহ কোনওভাবেই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না এবং তিনি মোটামুটিভাবে প্রাচীন টলেমীয় ধ্যানধারণা মেনেই চলেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন যে, জয় সিংহ তাঁর থেকে প্রায় তিন শতক আগে রচিত 'জিগ-ই-উলুগ বেগ'-কে আক্ষরিকভাবেই তাঁর 'জিজ'-এ তুলে এনেছেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে জয় সিংহ অন্তত এইটুকু ধারণা করেছিলেন যে জ্যোতির্বিদ্যাসংক্রান্ত পরিমাপনের ক্ষেত্রে পিতলের যন্ত্রগুলি নির্ভুল নয় এবং এই বিষয়ে নতুন পন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। কিন্তু এই 'সঠিকতা' বা 'সঠিক মুহূর্ত' সম্পর্কে তাঁর যে মোহ তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এর অন্তরালে কি জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা ছিল? ভারতীয় সমাজ জীবনে সঠিক মুহূর্তের (যজ্ঞের সময় বা বিবাহের সময় ইত্যাদি) গুরুত্ব অপরিসীম ছিল এবং জয় সিংহ এই সমাজ জীবনেরই অন্তর্গত। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং গভীর শাস্ত্রীয় আচারমনস্ক পুরুষ। তিনি বিভিন্ন কঠিন বৈদিক যজ্ঞাদি যেমন বাজপেয়, অশ্বমেধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত করেছিলেন। সুতরাং তাঁর 'জিজ' সঠিক সময় বা মুহূর্ত নির্ধারণের উদ্দেশ্যই অভিপ্রেত, তাঁর বিচারশক্তি বা তাঁর কোনও নতুন আবিষ্কারের বিবরণের উদ্দেশ্যে নয়।[২২] জয় সিংহের জন্মের আগেই ভারতবর্ষে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল।[২৩] জয় সিংহ নিশ্চিতভাবেই এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। কালমাপক যন্ত্রের (ক্রোনোমিটার) অভাবে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে শুধুই সুদূরবর্তী পদার্থকে পর্যবেক্ষণ করা যায় কিন্তু পরিমাপ করা যায় না। জয় সিংহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরিমাপন। সুতরাং সমস্ত উৎসাহ বা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জয় সিংহ কিন্তু এক ঐতিহাসিক অসঙ্গতি হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকতে পারেন, এমন একজন মানুষ যিনি ছিলেন চিন্তাভাবনায় মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সংস্কারের পরিপোষক কিন্তু কালের হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক যুগের লোক ছিলেন।[২৪]

এই লেখাগুলি কিন্তু জয় সিংহের প্রচেষ্টাকে কোনওমতেই খাটো করার উদ্দেশ্যে নয়। সামান্য দূরদৃষ্টি বা সাহসের সাহায্যেই তিনি তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমিতির উত্তরণ ঘটাতে পারতেন। টলেমীয় চিন্তাধারাকে তিনি যে সবসময় অনুসরণ করেছেন তা নয়। এর আগে, শাহজাহানের রাজত্বকালে মোল্লা মাহমুদ জৌনপুরি তাঁর 'সামস-ই-বাজেযা'য় এই মতবাদগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[২৫] পরবর্তীকালে জয় সিংহের 'জিজ' সম্বন্ধে মন্তব্য করে মির্জা খইরুল্লা খাঁ লিখেছেন :

'যখনই আমরা বৃত্তের গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে যাই তখনই দেখা যায় তা বাস্তবে পরিলক্ষিত অবস্থানের সঙ্গে মেলে না। অপরপক্ষে যখন কক্ষপথগুলিকে উপবৃত্ত হিসাবে ধরে সমীকরণের উদ্ভাবন হয়, এবং সেই সমীকরণের সাহায্যে অবস্থান নির্ণয় করা হয়, তখনই দেখা যায় যে বাস্তব অবস্থানের সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে। অতএব সংগতভাবেই বলা যায় কক্ষপথগুলি উপবৃত্তাকার।'

Scanned by CamScanner

এখানে লক্ষণীয় ঘটনা হচ্ছে মন্তব্যটি করা হয়েছে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। এমন কোনও প্রমাণ নেই যে খইকল্লা খানের কোপলার সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল।[১৪] অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে কিছু কিছু রচনা পাওয়া যায় যেগুলি হয় ইউরোপীয় রচনার অনুবাদ নয়ত, ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে রচিত। উদাহরণস্বরূপ আবুল খৈর ঘিয়াসুদ্দিন বলা যায় উইলিয়াম হান্টারের কোপার্নিকাসের পদ্ধতির উপর লেখা বইয়ের ফারসি অনুবাদ করেন, কিন্তু সমগ্র কাজটি হান্টারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে করা হয়েছিল।[১৫]

জ্যোতির্বিদ্যার মতো ভারতীয় প্রযুক্তির ব্যাপারেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বহু বিদেশী পর্যবেক্ষকরা ভারতীয় ইস্পাত (উট্জ্) ও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মান লক্ষ করে বিস্ময়াবিভূত হয়েছেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্প, ধাতুবিদ্যা, স্থাপত্য ও জাহাজ নির্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে প্রশংসা করে ইউরোপীয় পর্যটকরা যা লিখেছেন তার উপর ভিত্তি করে সাংগোয়ান লিখেছেন : 'অষ্টাদশ শতকের সূচনাতেই ভারতবর্ষ উন্নততর প্রযুক্তির দেশ হিসাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। ভারতীয় কারিগররা তাঁদের পেশায় যথেষ্ট উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা এমন কিছু নতুন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন যা আরও বেশি উপযোগী হয়েছিল। প্রাক শিল্প (প্রাক-ঔপনিবেশিক?) যুগের ভারতবর্ষে প্রযুক্তির বিবর্তনের এক ধারাবাহিক পদ্ধতি লক্ষ করা যায়।'[১৬]

কিন্তু সাংগোয়ান এই 'পদ্ধতির' কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ দেননি। 'পদ্ধতিগুলি কি 'ধারাবাহিক' এবং 'উপযোগী' ছিল? যদি তা হয়ে থাকে তবে পরবর্তী পর্যটকরা, যাঁদের রচনা থেকে সাংগোয়ান বারবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ভারতীয় উৎপাদনের এত কঠোর সমালোচনা করতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়ালেস, মুনরো, বুকানন এবং ওরলিচ—এঁরা সকলেই ভারতীয় কৃষি প্রযুক্তিকে 'অত্যন্ত নিম্নস্তরের, শত শত বছর ধরে নিশ্চল এবং অশিক্ষিত ও কুপরিচালিত গ্রাম্য যন্ত্রবিদ্যা' বলে বাতিল করেছেন। মার্টিন, ফ্রেজার, মুরক্র্যাফট ও দুবোয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে' অভিহিত করেছেন 'অত্যন্ত প্রাচীন, স্থূল, অপটু, অবৈজ্ঞানিক এবং প্রাচ্যের এক নিশ্চল উত্তরাধিকার' বলে।[১৭] অবশ্য এই ধরনের নিন্দাবাদ প্রাধান্য বিস্তারের পদ্ধতি বলেও মনে হতে পারে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সমালোচনা না করে তাঁরা ঔপনিবেশিকতাবাদকে সমর্থন করতে পারতেন না। তবে তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত দুর্বোধ্য (তাদের কাছে) গ্রন্থ বা অত্যন্ত সরল প্রযুক্তি সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকদের পক্ষে তা অনুধাবন করা বা উপলব্ধি করা বাস্তবিকই কঠিন।

কিছু নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বা যান্ত্রিক বিকাশকে এক সামগ্রিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনে, অনেক সময় পণ্ডিতদের সমর্থনের অযোগ্য ঘটনাকেও সমর্থন (বা প্রশংসা) করতে হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ধর্মপাল লিখেছেন : 'নির্মাণের মূল তথ্য ও পদ্ধতির

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্মাণের ক্ষুদ্রত্ব বা সরলতা আনা হয়েছিল, যেমন লোহা বা ইস্পাতের প্রয়োজনে 'ফার্নেস', অথবা লাঙ্গলের ফলা। স্থূল হওয়ার পরিবর্তে, অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় পদ্ধতি এবং যন্ত্রাদির তত্ত্বের পর্যাপ্ত আধুনিকতা এবং গভীর নান্দনিক জ্ঞানের ফসল বলেই প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি (এবং তার পরিণতি হিসাবে রাজনৈতিক পরিকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানগুলি)-এর মান এবং স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষয়িষ্ণু তো ছিল না বরঞ্চ বাস্তবিকভাবেই ভারতীয় সমাজের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করত।'[১৯]

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে 'কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি, সেচব্যবস্থা এবং কিছু কিছু কারিগরি শিল্প সেই সময়কার প্রয়োজন এবং দক্ষতা অনুযায়ী ছিল, কিন্তু ধর্মপাল যে, 'তত্ত্বের আধুনিকতা'-র কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্টতই অনুপস্থিত ছিল। ১৮২০ সালে রচিত ওয়াকারের ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার বর্ণনার মধ্যে অন্য এক পণ্ডিত 'পরিবেশ অনুকূল কৃষিকার্য' লক্ষ করেছেন।[২১] কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতির বৈচিত্র্য, লাঙ্গলের ফলা, ধান রোপণ (স্থানান্তরিত) পদ্ধতি এবং একই জমিতে বিভিন্ন ফসল ফলানো ভারতীয় কৃষকদের ব্যাপক অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। তাদের কৃষিকার্যের প্রযুক্তি নিশ্চল তো ছিলই না বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের 'দর ফন-ই-ফলাহাৎ' নামের বইটিতে কলম (গাছের) করার, জমি প্রস্তুত করার প্রণালী, চাষবাসের পদ্ধতি, জল এবং সারের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা আছে। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বইটিতে পুং ও স্ত্রী উদ্ভিদের উল্লেখ আছে (আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের উদ্ভিদের প্রাণ প্রমাণ করার দু'শ বছর আগে)।[২২] পরবর্তীকালে ফারসি ভাষায় উদ্ভিদের বিভিন্ন উপযোগিতা বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৭৯০ সালে আহমেদ আলী প্রণীত 'নাখল বন্দিয়া' এবং আমানুল্লা হসেন রচিত 'নুস্কা-ই-কুখ বদ'-এর উল্লেখ করা যায়।[২৩] পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন সেচ ব্যবস্থা করা হত। থর মরুভূমির ঊষর অঞ্চলে নদীর উচ্চখাত থেকে প্রবাহিত জল সঞ্চয় করার জন্য 'খাদিন' পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম মহারাষ্ট্রে 'ফাদ' পদ্ধতি এবং সুদূর দক্ষিণে 'খুদিমারাম্মাত' পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। উভয় পদ্ধতিতেই জলসম্পদ ব্যবহার গোষ্ঠীগতভাবে পরিচালিত হত। পদ্ধতিগুলি কৃষকদের যৌথ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিণতি হিসাবেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। কিন্তু তাহলেও অষ্টাদশ শতকে জাপানে যে 'সারিবদ্ধ চাষের' প্রবর্তন হয়েছিল, তার সঙ্গে এই পদ্ধতিগুলি কখনই তুল্য নয়। এই জাপানি পদ্ধতিতে সুচিন্তিত বীজ নির্মাণের সাহায্যে আবাদি ফসলের বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্য আনা হত, ট্রেডমিল ও ডাচ পাম্পের সাহায্যে সেচব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হত এবং প্রসারণ ঘটানো হত।[২৪]

ধর্মপালের মতো আলভারেজও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় কৃষিকার্য এবং বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে লিখেছেন।[২৫] ওলন্দাজ ও ফরাসিরা ভারতীয় রঞ্জনকার্য

Scanned by CamScanner

প্রণালীর অনুকরণ করার চেষ্টা করেন কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হতে পারেননি। যেসুইট পুরোহিত ফোর্গোর চিঠিপত্রগুলি (১৭৪২–৪৭)-তে এবং রোকে ও বুলিড-এর পাণ্ডুলিপি (১৭৩৪)-তে ইউরোপীয় বস্ত্রশিল্পের উপর ভারতীয় প্রভাবের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়।[১৬] যাই হোক, ঘটনা হচ্ছে এই প্রযুক্তির স্থানান্তরণ ইউরোপীয়রা নিজেরাই করেছিল। একইভাবে ভারতীয় ইস্পাতের (উট্‌জ)-এর মানও যথেষ্ট উন্নত ছিল। কোনামসুদরমে যে ইস্পাত উৎপাদিত হত ইস্পাহানের ব্যবসায়ী তা কিনতেন বিখ্যাত দামাস্কাস ব্লেড তৈরি করার জন্য। ভারতীয় লোহার উচ্চ মানের কারণ ছিল যে তা অল্প তাপে, এবং অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হত। শুধু তাই নয় যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে লোহা উৎপাদিত হত, তাতে কিন্তু এই উৎপাদন ছিল অত্যন্ত অল্প পরিমাণে[১৭], এবং সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে অবশ্য ইউরোপ এই সময় দ্রুতগতিতে বিপুল উৎপাদনের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয় কামাররা বেশি উত্তাপের সৃষ্টি করতে পারত না এবং বড় বড় 'ফারনেস' ও ব্যবহার করত না কারণ তাপ সৃষ্টির জন্য কাঠ কয়লা বা ভারবহনকারী পশু ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবহার তারা জানত না। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া জল-শক্তির ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। এরফলে উৎপাদনের খরচ ছিল অত্যন্ত বেশি এবং সেই কারণেই ভারতীয় কৃষকরা খুব কম মাত্রায় লোহার ব্যবহার করত। একইভাবে খনি-খনন কার্যও ও খুব সীমিতভাবে হত। যেটুকু হত তা কোদাল বা শাবলের সাহায্যে মাটির উপরের স্তর থেকেই খুঁড়ে বার করা হত। জল স্তরের নীচে খনন এবং খনিজ পদার্থ উত্তোলন সম্পূর্ণভাবে চিন্তার বাইরে ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যদিও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বারুদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল খননের ক্ষেত্রে তা কখনও ব্যবহার করা হয়নি।[১৮]

এতৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ খনিজ-শিল্প প্রচলিত ছিল এবং মোটামুটি তা কুটির শিল্প হিসাবেই চলত। প্রমাণ হিসাবে রাজস্থান, বিহার এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে নানারকম খনিজ পদার্থ—যেমন লোহা, ইস্পাত, তামা, সীসা, দস্তা এবং সামান্য কিছু ক্ষেত্রে রূপা এবং কোবাল্টের ধাতুমল (স্ল্যাগ) পাওয়া গেছে।[১৯] ভারতবর্ষে দস্তার উৎপাদন ইউরোপের আগে থেকেই চালু ছিল।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যাপারে ভারতীয়রা অনেক বেশি আগ্রহী ছিল এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের থেকে উন্নতও ছিল। আলভি এবং রহমান ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের এক কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র এঁকেছেন, যার থেকে জানা যায়-যে ফাতউল্লা শিরাজি নামে এক ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ একাধিক নল বিশিষ্ট কামান (মেশিন গানের পূর্বসূরী), কামানের নল পরিষ্কারের যন্ত্র (যাকে বলা হত ইয়ারঘু) এবং 'ওয়াগন-মিল তৈরি করেছিলেন।[২০] শিরাজি উদ্ভাবক ছিলেন না কিন্তু একজন উচ্চস্তরের উপযোজনকার ছিলেন। তিনিই প্রথম একাধিক ক্ষেত্রে 'গীয়ারহুইল' ব্যবহার চালু করেন এতদিন যা কেবলমাত্র জল তোলার জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু মুঘল যুগের কারখানায় এগুলি

খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার করা হত, গণ-উৎপাদনের প্রয়োজনে নয়। অষ্টাদশ শতকের হায়দার আলী এবং টিপু সুলতানের বাহিনীর রকেট ব্যবহারের কাহিনী শোনা যায়। মহীশূরের রকেট ব্রিটিশ রকেটের থেকে অনেক উন্নত মানের ছিল, কারণ গোলার জন্য লোহার নল ব্যবহার করা হত যার ফলে গোলাগুলি অনেক উঁচু হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ত।[২১] নলের ব্যাস ছিল ৬০ মি মি এবং দৈর্ঘ্য ২০০ মি মি। নলটি প্রায় ৩ মিঃ লম্বা বাঁশের দণ্ডের সাথে বাঁধা থাকত। রকেটগুলি প্রায় ১ কিমি থেকে ২ কিমি দূর পর্যন্ত ছোড়া যেত। ১৭৮০ সালে পেলুরের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়, কারণ কর্নেল বেইলীর অস্ত্র বোঝাই গাড়িগুলি মহীশূরের রকেটে ধ্বংস হয়ে যায়। যদিও এর ফলে ব্রিটিশদের মধ্যে যথেষ্ট ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সঞ্চার হয়েছিল কিন্তু যেহেতু রকেটগুলি অনেক সময়েই নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত করতে পারত না সেইজন্য টিপু সুলতানের পক্ষে এর সাহায্যে বেশি যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়নি। শেষ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ওয়েলেসলী (পরবর্তী কালে ওয়াটারলু যুদ্ধের নায়ক) পর্যন্ত মহীশূরের রকেট আক্রমণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কিছু রকেটের কাঠামো বিশ্লেষণ করার জন্য ইংলন্ডে পাঠানো হয়েছিল এবং এর ফলে রকেট সম্বন্ধে ইউরোপে প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। ইংলন্ডে উইলিয়াম কনগ্রেভ এই ব্যাপারে ব্রতী হলেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রয়োগ করা হল, যথাযথ পরিকল্পনা ও নক্‌শা তৈরি হল এবং রকেট প্রস্তুত হওয়ার পর তার পরীক্ষা করা হল ও মূল্যায়ন করা হল। এই সমস্ত পদ্ধতি অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।[২২] এই সমস্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বোঝা যায় যে কেন ভারতবাসীরা ঔপনিবেশিকদের কাছে পরাস্ত হয়েছিল। আলভি এবং রহমান মনে করেন না যে ভারতীয় পরিকল্পনা বা কলকব্জা 'সম্পূর্ণ ভাবে সৃজনশীল শক্তি রহিত' ছিল। বরঞ্চ তার মধ্যে প্রযুক্তিগত ধ্যান-ধারণার যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল এবং পরবর্তী কালে এগুলির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করলে নিশ্চিত ভাবেই তার থেকে এক স্বতন্ত্র প্রযুক্তিগত ঐতিহ্যের সূচনা হত।[২৩]

কিন্তু বিপত্তি হচ্ছে ইতিহাসের সহজাত অনিশ্চয়তা যার থেকেই আমরা তৃতীয় মতবাদটি পাচ্ছি। এই মতবাদের প্রবক্তারা প্রাক ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিনাবাক্যে বাতিল করেন না আবার নির্বিচারে প্রশংসাও করেন না। জাতীয় আন্দোলনের চরম সময়ে ১৯৩০-এর দশকে বি. কে. সরকার নীচের প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তুলনা টানেন[২৪] :

১। ভারতীয় গবেষণামূলক বিজ্ঞান (৬০০–১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) = ইউরোপীয় গবেষণামূলক বিজ্ঞান (৬০০–১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)

২। ভারতীয় রেনেশাঁস (১৩০০–১৬০০) = ইউরোপীয় রেনেশাঁস (১৩০০–১৬০০)

৩। ভারতীয় গবেষণামূলক বিজ্ঞান (১৬০০–১৭৫০) = ইউরোপীয় গবেষণামূলক বিজ্ঞান (১৩০০–১৬০০)

Scanned by CamScanner

অতএব, রেনেশাঁস পরবর্তী যুগে (দেকার্তে এবং নিউটনের) অর্থাৎ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকেই ইউরোপ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করে। ধর্মপাল মেনে নিচ্ছেন যে সম্ভবত ১৭৫০ সাল থেকেই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পতন শুরু হয় এবং পরবর্তী কয়েক শতক ধরে চলে।[১০৫] ইরফান হাবিব প্রাক ঔপনিবেশিক প্রযুক্তিকে আদিম বলে মেনে নেননি বরঞ্চ তিনি চাইছেন যে যেসমস্ত সামাজিক প্রতিবন্ধক শিল্প প্রযুক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে আধুনিক ইউরোপের স্তরে নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে বা ইউরোপীয় প্রযুক্তিকে দ্রুত আত্মসাৎ করতে বাধা দিয়েছে, সেগুলি নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হোক।[১০৬, ১০৭] তিনি তথ্য সহযোগে বক্তব্য রেখেছেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতির জন্য যে ধরনের তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয় তার বেশ কিছু ভারতবর্ষে মুঘল যুগেও ব্যবহৃত হত, তবে অবশ্যই সীমাবদ্ধভাবে। প্রাক ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিশ্চিতভাবেই আদিম ছিল না। 'আদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' বোধহয় উপযুক্ত সংজ্ঞা এবং এই সংজ্ঞার দ্বারা সপ্তদশ শতকের পরবর্তী কালের আধুনিক গবেষণামূলক বিজ্ঞানের সঙ্গে এর পার্থক্য আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝানো যাবে।[১০৮]

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় প্রযুক্তির প্রতি ভারতীয় প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে এ. জে. কাইজার কখনই ভারতীয়দের বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষী বলেননি। তিনি লিখেছেন 'যতদূর পর্যন্ত নিজস্ব স্বাভাবিক ও এক বিকল্প প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতীয়রা তাদের নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে পারত, ততদূর পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপীয় প্রযুক্তির দিকে নজর দেওয়া হয়নি।'[১০৯] বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত বিনিময় ও যোগসাজসের পরিমাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন উৎকর্ষসাধন হয়েছে, তেমনই গ্রহণ যোগ্যতাও বেড়েছে। ক্ষেত্রগুলি হল জাহাজ নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্র, খনিজ বিদ্যা, এবং স্থাপত্য। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিস্ফুরণ ঘটেছিল, যেমন যান্ত্রিক ঘড়ি, মুদ্রণযন্ত্র, দূরবীক্ষণযন্ত্র, কয়লা ইত্যাদি যেগুলি মোটামুটিভাবে দুর্লভ বস্তু হিসাবেই থেকে গিয়েছিল। সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না বলেই এইগুলি ভারতীয় অভিজাতদের নজর কাড়েনি। কেবলমাত্র যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন থাকায় কামান, বন্দুক আর গোলন্দাজ আমদানি করা হত। ভারতীয় সম্রাটরা কেবলমাত্র সেই বস্তুরই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন যার মধ্যে ছিল আভিজাত্যের সৌরভ। (দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ইতর-ই-জাহাঙ্গিরি',-একটি পাতন যন্ত্র, এর মধ্যে একটি 'নূরজাহান বা ভাপক' এখনও বর্তমান)। সম্রাট বা ব্যবসায়ী কেউই প্রযুক্তি-উন্নয়নের দিকে নজর দেয়নি। একমাত্র গরিব কারিগররাই যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অনুভব করত এবং যন্ত্রের অভাবকে ব্যক্তিগত দক্ষতা দিয়ে জয় করতে হত। যে দক্ষতা দেখা যায় ঢাকাই মসলিন, ইস্পাত (উটজ) এবং অত্যুৎকৃষ্ট রঙিন ছাপ এর ক্ষেত্রে। এই ধরনের উৎকৃষ্ট হস্তশিল্পও কিন্তু স্বাবলম্বী হতে পারেনি, বরঞ্চ কৃষিভিত্তিক শাসনতন্ত্রের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল ছিল এবং

এই পদ্ধতির উপর কোনও চাপ এলেই এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত (যেমন অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে)।

সঠিকভাবে বলতে গেলে এটি একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। কিন্তু সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ব্যাখ্যা দেওয়া কি সম্ভব? শেষোক্ত শব্দটি আমাদের জাতিভেদ প্রথা স্মরণ করায়। কিন্তু কাইজার এই মতকে 'অত্যন্ত ভ্রান্ত এবং অন্যান্য কল্পনার অংশ' বলে সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করেছেন।[১১০] তিনি বলেছেন যে এমন কোনও দৃষ্টান্ত নেই যেখানে জাতিভেদের অজুহাতে কোনও প্রযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ঘটনাটি সত্য বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। একথা ঠিকই যে জাতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং পাশাপাশি পেশার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই নমনীয়তাই গ্রাম এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে যে বংশগত বিভাজন, ও শ্রেণী বিন্যাস ছিল তাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। আচার্য পি.সি. রায়ই বিজ্ঞানের প্রথম ঐতিহাসিক যিনি দেখেছিলেন যে জাতিভেদ প্রথার মধ্যেই এমন কিছু আছে যা চুপিসাড়ে বিজ্ঞানকে চলনশক্তি হীন করে তুলেছে।[১১১] এই জাতিভেদই তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে এবং মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে এক বিধ্বংসী বিভেদের সৃষ্টি করেছে। তিনি লিখেছেন: 'সমাজের বুদ্ধিজীবী মহল সাধারণভাবে উৎপাদন-ভিত্তিক শিল্পগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করায়, ঘটনার কারণ ও ব্যাখ্যা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পারস্পরিক যোগাযোগ—সামগ্রিকভাবে অনুসন্ধানের ইচ্ছাই ক্রমশ মরে যেতে থাকে। ভারতের মাটি হয়ে ওঠে কোনও বয়েল, বা দেকার্তের বা নিউটনের জন্মগ্রহণের জন্য প্রতিকূল....'[১১২]

অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীদের এই নিস্পৃহতাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছিল তৎকালীন শাসকবর্গের মেধাগত বিপুল ব্যর্থতা। জয় সিংহ তাঁর রাজসভায় বেশকিছু পণ্ডিতদের আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু তিনি কোনও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা চিন্তা করেননি যেখানে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজগুলি চালিয়ে যাওয়া যাবে বা আরও উন্নতি সাধন করা যাবে। বিজ্ঞানের অধ্যয়ন প্রায় ছিল না বললেই চলে, এবং যেটুকু ছিল তাও নদীয়া ও মিথিলার 'ন্যায়-তর্কের' আবর্তে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রায় তিনশ বছর আগে আবুল ফজল পরিতাপ করেছেন। 'সংস্কারের (তাকলিদ) ঝড় বইছে, জ্ঞানের আলো নিভে গেছে...জিজ্ঞাসার দ্বার রুদ্ধ; প্রশ্ন এবং অনুসন্ধানকে অর্থহীন ও নিকৃষ্ট ধর্মাচরণ (প্যাগানিসম) বলে মনে করা হচ্ছে।'[১১৩]

এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত থাকলে হয়তো আরও রূঢ় সমালোচনা করতেন। প্রাচ্যের শিক্ষার মধ্যে আধুনিক জ্ঞানের কোনও

Scanned by CamScanner

স্থান ছিল না; তবু নতিস্বীকারের মুখোমুখি হয়েও একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, এই (মনোভাবকে) সমর্থন করেছেন এই যুক্তিতে যে যদি আমরা একে সমর্থন না করি তবে আমরা নিজেদের এবং যাদের উন্নতির দায়িত্বে রয়েছি, এই উভয় পক্ষেরই অবনতি ঘটাব। পরম্পরাগত বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার ধারা বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধান না দিলেও আরেক ধরনের অত্যন্ত জরুরি বিষয়ের তথ্য জানায় সেটি হল বিষয় বস্তুগুলি নিয়ে, মানুষের চিন্তাধারা, বিচার প্রণালী ও কী পর্যায়ক্রমে মানুষ সত্যে উপনীত হয়েছে সে সম্পর্কে। সংক্ষেপে এটি হল মানুষের মতবাদের ইতিহাস ও বিষয়টি মানুষের কর্মকাণ্ডের (ইতিহাসের) মতোই প্রয়োজনীয়।[১১৪]

Scanned by CamScanner